بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জুন, ২০১৬ মোতাবেক ২৪ এহসান, ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় বলা হয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকা, তাঁকেই সকল শক্তির আধার জেনে তাঁরই কাছে যাচনা করা এবং তাঁর নির্দেশনাবলী মেনে চলা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলো কী? গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুরআনের মত মহান গ্রন্থ দান করেছেন, যাতে খোদার সকল নির্দেশ এবং আদেশ ও নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, আমার বান্দারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়। এর অর্থ কুরআনে যেসব নির্দেশ রয়েছে, সেগুলোকে তাদের শিরোধার্য করা উচিত। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা দোয়াও গ্রহণ করবেন আর হিদায়াতও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অবশেষে কী ফলাফল প্রকাশ পাবে, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ, তারা যেন সঠিক পথ পায় আর এই হিদায়াত লাভের কল্যাণে আমার নৈকট্য প্রাপ্তির দৃশ্য তারা প্রত্যক্ষ করে। তাদের এমনই হওয়া উচিত, যারা হবে সঠিক পথের পথিক এবং তাদের জন্য থাকবে পথ-নির্দেশনা। আর তারা সৎকর্মশীল, পাপ বর্জনকারী এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনকারী হবে এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে চলবে। এখন প্রশ্ন হল, এ সব বিষয়ের প্রয়োজন কি শুধু রমযানেই রয়েছে, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? আর আমরা যদি রমযান মাসেই খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলি, তবে কি শুধু রমযানে আমল করার সুবাদেই স্থায়ী হিদায়াত লাভ হবে? রমযান তো ঐ সব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আসে এবং এসেছে যে, প্রশিক্ষণ ও সংগ্রামের এই মাসে আমরা যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সংগ্রামে রত থেকে পরস্পরের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ সন্ধান করি। আমরা যেন সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়ে তাঁর নিকটতর হই এবং আমাদের দোয়াগুলোকে এর গৃহীত হওয়ার মার্গে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, এর ফলে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী নৈকট্যভাজন হয়ে আমাদের উভয় জগতকেই সুশোভিত করে তুলতে পারি। আমাদের অনেকেই আছেন, যারা উন্নত মানের আমল ও ইবাদতকারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এ জন্য এ দিনগুলোতে আমরা যখন সমবেত হই আর পরস্পরকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেখার সুযোগ পাই, তখন এর মাধ্যমে আমাদের নিজেদের অবস্থার প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

কুরআনে অগণিত আদেশ-নিষেধ রয়েছে। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে (কোন কাজ) করতে অথবা না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় সেগুলোকে আমাদের রোমন্থন বা পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এমনই কিছু নির্দেশ আমি এখন উপস্থাপন করছি।

সবচেয়ে মৌলিক যে নির্দেশটি সর্বদা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও বটে, তা হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন যে, **"আমি জিন্ন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"** (বারাহীনে আহমদীয়া, তৃতীয়াংশ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫ টীকা)

এই বিষয়টি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বলেছি এবং বারবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণও করে থাকি। কিন্তু আমাদের অনেকেই কিছুদিন এটি স্মরণ রেখে আবার ভুলেও যায়। আমি জানি, এমনকি দেখেছি, কতক ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, বরং যারা ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করেছে আর জ্ঞানের দিক থেকে

এর গুরুত্ব সম্পর্কেও অবগত, তারাও এদিকে সেভাবে দৃষ্টি দেয় না, যেভাবে দেয়া উচিত। এছাড়া জামা'তের ওহদাদার বা পদধারী কর্মকর্তারাও রয়েছেন, যারা মিটিংয়ে নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশের চেষ্টা করে, কারো কোন সমস্যা উপস্থাপিত হলে তাকে তারা কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝিয়েও থাকে। কিন্তু অনেকেই এমন আছে, যারা নিজেরা মৌলিক এই নির্দেশের উপর সেভাবে দৃষ্টি দেয় না, যেভাবে দেয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"এ কথাটি তোমরা ভালোভাবে অনুধাবন কর যে, তোমাদের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁরই হয়ে যাও। এই বস্তুজগতই যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। এ বিষয়টি আমি বারবার বর্ণনা করি, এর কারণ হল, আমার মতে এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, অথচ এটি থেকেই সে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

তিনি (আ.) এই বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বলেছেন, এই বস্তুজগতকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির না করার অর্থ এটি নয় যে, জাগতিক কার্যকলাপ তোমরা আদৌ করবে না। পার্থিব কাজকর্ম অবশ্যই করবে, কিন্তু ইবাদতের যে দায়িত্ব রয়েছে, বরং বলা উচিত, সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, তা যেন সর্বাগ্রে তোমাদের কাছে প্রাধান্য পায়।

রমযান হওয়ার কারণে এর উপর আজকাল এমনিতেই আমল হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ইশার নামায অনেক দেরীতে হয়। নামায শেষ করতে এগারটা থেকে সোয়া এগারটা বেজেই যায়। এরপর কেউ কেউ তারাবির নামাযও পড়ে। মসজিদে তারাবির ব্যবস্থাও আছে, যার ফলে বাড়ি ফিরে ঘুমাতে ঘুমাতে বারোটা, সাড়ে বারোটা বেজে যায়। আবার দু'টা-আড়াইটায় সেহরী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতে হয়। কেউ কেউ নফল নামায (তাহাজ্জুদ)ও পড়ে এবং নামাযের জন্য মসজিদেও আসে। অতএব, এটি থেকে প্রমাণিত হয়, যদি ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ, শুধু জ্ঞানগত গুরুত্বই নয় বরং বাস্তব প্রচেষ্টাও থাকে, তাহলে উন্নত মানের ইবাদত-ক্ষেত্র নামাযে আলস্য দেখাবেন না, বরং সচেষ্ট হয়ে মসজিদে আসুন। মসজিদে এসে জামা'তের সাথে নামায পড়াও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। অতএব, এই রমযানে ওয়াকফে যিন্দেগী, যাদের অঙ্গীকার রয়েছে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার আর সবার মাঝে অগ্রগামী থাকার জন্য আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করব। আর ওহদাদার বা পদধারী কর্মকর্তাগণ, যাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি রয়েছে আর যাদেরকে তারা নির্বাচনও এজন্যই করে যে, আমাদের মাঝে তারা সর্বোত্তম, এদের উভয়ের (অর্থাৎ, ওয়াকফে যিন্দেগী ও কর্মকর্তাদের) আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত যে, কেবল রমযান মাসেই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পন্থায় ইবাদত করার প্রতি মনোযোগী হব না এবং এভাবে কেবল দিনই গুণতে থাকব না যে, আর মাত্র বারো বা তের দিন রয়ে গেছে, এরপরই আমরা আমাদের পুরোনো অভ্যাস বা রুটিনে ফেরত যাব। বরং চেষ্টা করতে হবে, এই রমযানের প্রশিক্ষণ এবং সংগ্রাম ও সাধনা আমাদের মাঝে ইবাদতের যে চেতনতা সৃষ্টি করেছে, সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করতে হবে আর আমাদেরকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যেভাবে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছি, যেখানে তিনি গভীর বেদনার সাথে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, আমি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করি। এই প্রেক্ষাপটে আমি তাঁর আরো কিছু উদ্বৃতি উপস্থাপন করব, যার মাধ্যমে এ বিষয়টি অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "মানব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র উদ্দেশ্য যখন ইবাদত করা, তখন অন্য কিছুকে পরম লক্ষ্য স্থির করা কোন মু'মিনের জন্য শোভন নয়। মানবাত্মার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা বৈধ হলেও প্রবৃত্তির ভারসাম্যহীনতা বৈধ নয়। নফসের অধিকার রক্ষা করা বৈধ হওয়ার কারণ হল, এটি যেন আবার অক্ষম হয়ে না যায়। তোমরাও এ জিনিসগুলোকে এ উদ্দেশ্যেই কাজে লাগাও। এগুলোকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর, যেন তা

তোমাদেরকে ইবাদতের যোগ্য করে রাখে। এমনটি যেন না হয়ে যে, সেগুলোই তোমাদের মূল লক্ষ্য হবে। **(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৮-২৪৯, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

নফসের অধিকার প্রদানের কথা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের উপর তোমাদের নফসেরও অধিকার রয়েছে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সওম, বাব- মাসন আকসামা আলা ... হাদীস নম্বর ১৯৬৮)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে এ অধিকার রয়েছে কিন্তু এতে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। নফসের বৈধ অধিকার প্রদান কর। কেননা, এই অধিকারের বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতির অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। তাই, এগুলো প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। এগুলোকে নিজেদের কাজে নিয়োজিত কর। অন্যথায় কিছু কিছু জিনিস এমন আছে, যেগুলোকে ব্যবহার না করলে অর্থাৎ, নফসের অধিকার প্রদান না করলে কিছু অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আর এটি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, বরং ইবাদতের পাশাপাশি এগুলো ব্যবহার করাও আবশ্যক। খোদা সৃষ্ট বিশেষত্ব ও শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগানো আবশ্যক। আর সেগুলোকে ব্যবহার না করা খোদার প্রতি অকৃতজ্ঞতার শামিল। একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, বেশ-ভূষার প্রতি তার কোন দৃষ্টি ছিল না, এমনকি চুলও আঁচড়াত না। মহানবী (সা.)-এর সমীপে তার সম্পর্কে কেউ নিবেদন করে যে, সে এভাবে থাকে। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান। এসে তিনি (মহিলা সাহাবী) বলেন, আমি পরিপাটি থাকব কার জন্য? আমার স্বামী তো দিনেও ইবাদত করে আর রাতেও ইবাদত করে। এ কথা শুনে মহনবী (সা.) তার স্বামীকে ডেকে এনে বলেন, তোমার উপর তোমার নফসেরও অধিকার রয়েছে আর তোমার স্ত্রী'রও অধিকার রয়েছে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৫৩১, হাদীস নম্বর: ২৬৮৩৩৯, ... আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮ইং-প্রকাশিত।)**

অতএব, সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা আবশ্যক ঠিকই কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য রাখতে হবে। নফসের অধিকার প্রদান করা হলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সঠিকভাবে ইবাদত করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন,

"অযথা ব্যবহারের ফলে হালাল বা বৈধ জিনিসও হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)** থেকে বুঝা যায়, মানুষকে কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যতটুকু তার প্রয়োজন এরচেয়ে বেশি নিলে তা হালাল বা বৈধ হলেও অতিরিক্ত হওয়ার কারণে তার জন্য তা হারাম বা অবৈধ হয়ে যায়।" সব কিছুর বৈধ ব্যবহার যথার্থ কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন,"প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণের জন্য যে ব্যক্তি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে, সে কীভাবে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে? মু'মিনের জন্য আবশ্যক, সে যেন এক নির্মোহ বা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে, অন্যথায় বিলাসিতায় মগ্ন থাকলে সে জীবনের এক দশমাংশও অর্জন করতে সক্ষম হবে না। **(মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল, স্বীয় প্রভুকে চেনা এবং তাঁর আনুগত্য করা। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)**। অর্থাৎ, আমি জিন্ন ও মানুষকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, পৃথিবীতে জন্ম নেয়া অধিকাংশ মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে এবং নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিগোচর না রেখে আল্লাহ্ তা'লার আঁচল ছেড়ে দিয়ে পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও সম্মান লাভের আসক্তিতে এমনভাবে মজে যে, তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র অংশ খুব কমই থাকে আর অনেক মানুষের হৃদয়ে তো থাকেই না। কেননা, তারা জগৎ প্রেমে মত্ত ও বিভোর হয়ে যায়। খোদা বলতে যে কেউ আছেন তাও তারা জানে না। তারা কেবল তখনই বুঝে, যখন আজরাঈল এসে রূহ কবজ করে। **[আল্ হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, পৃ: ১, ৮ম খণ্ড, সংখ্যা ৩২, উদ্ধৃতি, তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৯]**

পার্থিব জীবনের ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাট থেকে তারা তখন বের হয়, যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। বরং অধিকাংশ দুনিয়াদার বা বস্তুবাদী মানুষের অবস্থা এমন যে, মৃত্যুর সময়ও তারা পার্থিব ধনসম্পদ এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েই চিন্তাগ্রস্ত থাকে। একজন মু'মিনের অবস্থা কিন্তু এমন নয় যে, মৃত্যুর সময় তার দৃষ্টি কেবল পার্থিব সহায়-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। তবে অনেকেই এমন আছে, যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও সুস্থাবস্থায় জীবনের যে উদ্দেশ্য রয়েছে, তা ভুলে গিয়ে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। অতএব, আমাদের সবার এই চিন্তা অগ্রগণ্য রাখা উচিত, আমরা যেন জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। আর এই রমযানে এবং এরপরও যেন আমাদের মনোযোগ খোদার ইবাদতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর এর জন্য মসজিদ আবাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে, সেটিকে আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, মানুষের হৃদয়ে খোদার নৈকট্য লাভের এক বেদনা থাকা চাই, খোদার নৈকট্য লাভের জন্য মরমে এক ব্যথা থাকা উচিত, যার ফলে তাঁর অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মূল্যায়নের যোগ্য হয়ে যায়। **(মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

খোদার নৈকট্য লাভে কাতর এক বেদনা যখন হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সেই মানুষ মূল্যায়নের যোগ্য হয়ে যায়।

অতএব, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যে মূল্যায়নযোগ্য হয়, সে-ই আসলে সত্যিকার হিদায়াতপ্রাপ্ত, সঠিক পথের দিশা প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়পাত্র। আল্লাহ্ তা'লা নামায ও ইবাদতের বিষয়টি আরো বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা নূরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** (সূরা আন্ নূর: ৩৮) অর্থাৎ, এমন সুপুরুষও আছে, যাদেরকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ বা নামায কায়েম অথবা যাকাত প্রদানে উদাসীন করতে পারে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যে দিন হৃদয় ও দৃষ্টি ভয়ে উদ্বেগাকুল হবে। এই আয়াতে সেসব লোকের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যাদের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, তারা খোদার দৃষ্টিতে মূল্যায়নযোগ্য হয়ে উঠবে। আর এই সম্মান সবচেয়ে বেশি লাভ করেছেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ (রা.) আর এ জন্য তাঁরা খোদার প্রিয়ভাজন হয়েছেন। স্বীয় সাহাবীদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তাঁরা তোমাদের পথের দিশারী, তাদের অনুসরণ কর। **(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৪, কিতাবুল মানাকেব, বাব মানাকেবুস সাহাবা, ফাসলুস সালেস, হাদীস নম্বর, ৬০১৮, প্রকাশনী দারুল কুতুবিল ইলমীয়্যা, বৈরুত ২০০৩ইং)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ব্যক্তি সহস্র সহস্র রুপির ব্যবসা-বাণিজ্য করত। আল্লাহ্‌র এক ওলী তাকে দেখেন এবং কাশফী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন যে, এত ব্যাপক আর্থিক লেনদেন (অর্থাৎ, ব্যবসা করছে, অর্থ আসছে, মানুষকে জিনিসপত্র দিচ্ছেন, বাহ্যত ব্যবসা-বাণিজ্য ও এত অধিক লেনদেন) সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। [ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন ঠিকই, কিন্তু খোদা সম্পর্কে কখনোই উদাসীন হন নি। তিনি (আ.) বলেন,] এমন মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ** (সূরা আন্ নূর: ৩৮) অর্থাৎ, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে খোদা সম্পর্কে উদাসীন করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত যে, সে জাগতিক কাজ-কর্মেও ব্যস্ত থাকবে আবার খোদাকেও ভুলবে না।" তিনি (আ.) বলেন, "সেই টাট্টু ঘোড়া কোন্ কাজের, যার উপর বোঝা চাপালেই তা বসে পড়ে আর বোঝা না থাকলে খুব দৌড়ায়। এটি প্রশংসার যোগ্য নয়।" (এক ধরণের ঘোড়াকে টাট্টু ঘোড়া বলা হয়, বিশেষ করে যা পাহাড়ী অঞ্চলে বোঝা বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।) তিনি (আ.) আরো বলেন, "সেই ফকির, যে জাগতিক কাজের ভয়ে নিভৃতে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়, সে এক দুর্বলতা প্রদর্শন করে।" [এ দিকটিও দৃষ্টিতে থাকা চাই। ইবাদত অবশ্যই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু জাগতিক কাজ-কর্মের পাশাপাশি তা করতে হবে। যারা নিভৃতে ঘরের

কোনে বসে যায়, ফকিরী বা বৈরাগ্য পন্থা অবলম্বন করে। তিনি (আ.) বলেন, তারা দুর্বলতা প্রর্দশন করে।] "ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই। আমরা কখনো বলি না যে, স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ কর এবং জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। না, বরং চাকুরিজীবির উচিত চাকরির দায়িত্ব পালন করা এবং ব্যবসায়ীদের উচিত সুন্দরভাবে ব্যবসা করা কিন্তু তা করতে হবে ধর্মকে অগ্রগণ্য রেখে। (এটিই হল শর্ত। এর উদাহরণ পৃথিবীতেই বিদ্যমান রয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, এর উদাহরণ এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান। কেননা, একজন ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবি তাদের চাকরি ও ব্যবসার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের পরও তাদের স্ত্রী-সন্তান থাকে আর তারা তাদের অধিকার সঠিকভাবে প্রদানও করে। (এক দিকে ব্যবসা এবং চাকরিও রয়েছে আবার একই সাথে বাড়ি এবং সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব আর স্ত্রী'র অধিকারও রয়েছে, তা-ও সবাই প্রদান করে থাকে। দু'টি বিষয়ই সমান্তরালে চলতে থাকে।" তিনি (আ.) বলেন, "অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তি এসব ব্যস্ততার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র অধিকারও প্রদান করতে পারে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। **(মলফূযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২০৬-২০৭, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

নামাযের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (সূরা আল্ বাকারা: ২৩৯)** অর্থাৎ, নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী বা কেন্দ্রীয় নামাযের আর খোদা তা'লার দরবারে আনুগত্যের সাথে দন্ডায়মান হও। এ আয়াতে বিশেষ করে নামাযের প্রতি সেসব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাদের জন্য কোন কোন নামায বোঝাস্বরূপ। রাতে অধিক সময় জাগ্রত থাকার কারণে বা আলস্যের কারণে যদি ফজরের নামাযে অংশ গ্রহণ কঠিন হয় বা সময়মত পড়া কঠিন হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ফজরের নামায হল, 'সালাতুল উসতা'। ব্যবসায়ীর জন্য যদি যোহর বা আসরের নামায পড়া কঠিন হয়, তাহলে এই নামায তার জন্য সালাতে উসতা। **حَافِظُوا** শব্দের অর্থ হল, এমনভাবে হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা, যা কোন জিনিসকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। এক মু'মিন অনুগত বলে তখনই গণ্য হয়, যখন সে এসব নামায যথা সময়ে এবং যথাযথভাবে পড়ে। এমন নয় যে, তাড়াহুড়া করে এলাম আর মাটিতে কপাল ঠুকে চলে গেলাম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার রক্ষা করার এবং তা মেনে চলার নির্দেশও দিয়েছেন। এতে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং বান্দার সাথে কৃত চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার হল, আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম-বিষয়ক। মুসলমান হওয়ার কারণে আর বিশেষ করে আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার যে অঙ্গীকার করেছি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছি, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি আর এসব কথা মেনে চলার যে সব অঙ্গীকার রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে। এসব বিষয়ই বয়আতের শর্তাবলীর অন্তর্গত আর বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (সূরা আন্ নাহল: ৯২)** অর্থাৎ, আর তোমরা যখন আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার কর, তখন তা পূর্ণ কর। আর আল্লাহ্‌কে জামিনরূপে গ্রহণ করে কৃত শপথ পাকাপোক্ত করার পর তোমরা তা ভঙ্গ কোরো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (তা) ভাল করেই জানেন।

অতএব, সুস্পষ্ট নির্দেশ হল, তোমাদের দু'টি অঙ্গীকার রয়েছে। একটি হল, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার, যা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার এবং বয়আতের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারটি হল, আমি ইসলামভুক্ত হয়ে মুসলমান হওয়ার দাবি করে খোদার সকল নির্দেশ মেনে চলব। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা হল, তোমরা পারস্পরিক যে সব চুক্তিতে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও, সেগুলোও পূর্ণ কর। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলছেন, তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'লাকে

তোমাদের জামিন বানিয়ে নিয়েছ, তখন তোমাদের এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা আবশ্যক। এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, যেখানে স্পষ্টরূপে আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে তাঁকে জামিন বানানো হয় না, সেখানে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে কোন সমস্যা নেই, শপথ ভঙ্গ করলে কোন অসুবিধা নেই আর চুক্তির শর্ত না মানলেও কিছু যায় আসে না, এমন নয়। বরং তোমাদের করা প্রতিটি অঙ্গীকার ও চুক্তির প্রথম শর্ত হল, সেগুলো যেন ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন তা করবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল, এমনই হওয়া উচিত। কেননা, ইনসাফ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এক মু'মিনের জন্য আবশ্যিক। অন্যভাবে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বা তাঁকে জামিন বানিয়ে আমরা কোন চুক্তি করি বা না করি, তথাপি যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা হল, ইনসাফ ও সত্যের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত হও, তাই যে অঙ্গীকার বা চুক্তিই ইনসাফ এবং সত্য ও সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তা খোদার জামানতেরই অধীনস্থ হবে। কাজেই, এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, একজন মু'মিনকে তার সকল অঙ্গীকার এবং চুক্তি পূর্ণ করতে হবে। আমরা এ কথার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য বুঝতে আর অনুধাবন করতে সক্ষম হলে আমাদের সমাজ সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, প্রতারণা এবং দোষারোপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এতে করে পারিবারিক জীবনে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলোও সৃষ্টি হত না। কেননা, এসব ক্ষেত্রেও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়ে থাকে। ইদানিং আমি দেখছি, জাগতিক লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করা, প্রতারণা করা, মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা না করার প্রবণতা আমাদের মাঝেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জামা'তই শুধু কলঙ্কিত হয় না, বরং অনেক সময় এমন মানুষের ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কঠোরভাবে সতর্ক করে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১) অর্থাৎ- অতএব, তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলা পরিহার কর।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এখন আমার এই নসীহত করার কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমরা খুন করো না (হত্যা করো না, কারো রক্ত ঝড়িও না) কেননা, চরম দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চাইবে! তাই আমি বলব, অন্যায় হঠধর্মীতা প্রদর্শন করে সত্যকে পদদলিত করো না। সত্যকে গ্রহণ কর, তা এক বাচ্চার পক্ষ থেকেই হোক না কেন। (কোন শিশুও যদি কোন সত্য কথা বলে, তবে তা গ্রহণ কর আর জিদ করো না) আর বিরোধীর কাছেও যদি সত্য পাও, তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অন্তঃসারশূণ্য যুক্তি পরিহার কর। (তোমাদের বিরোধী কেউ থাকলে আর সে সত্য বললে অর্থাৎ, ঝগড়া-বিবাদ চলাকালে যদি দেখ যে, দ্বিতীয় পক্ষ সত্য ও সঠিক, তাহলে সেখানে বিতর্ক এবং যুক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নেই, বরং সত্যকে মেনে নাও।) তিনি (আ.) বলেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হজ্জ: ৩১) অর্থাৎ, প্রতিমার নোংরামী এবং মিথ্যা কথা বলা থেকেও আত্মরক্ষা কর। কেননা, প্রতিমার চেয়ে তা কোন অংশেই কম নয়। তোমাকে যা সত্যের কিবলা বা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে, তা তোমার জন্য এক প্রতিমাস্বরূপই। (যা তোমাকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে, তা-ই প্রতিমা।) তোমাদের পিতা, ভাই বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে দিতে হলেও সত্য সাক্ষ্য দাও। কোন শত্রুতা যেন তোমাকে ইনসাফ বা ন্যায় থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।" **(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫০)**

অ-আহমদীদের আমরা পবিত্র কুরআনের এ শিক্ষাই দেখাই আর বলি, 'এটি হল ইনসাফের বা ন্যায়ের শিক্ষা।' কিন্তু আমাদের অনেকে এমনও আছে, যারা নিজেদের বেলায় এ শিক্ষা ভুলে যায়।

আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এই মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সাথে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। (মিথ্যাকে প্রতিমা পূজার সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে)

যেভাবে এক নির্বোধ মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে ছেড়ে প্রতিমার সামনে মাথা নত করে, একইভাবে সত্য ও সাধুতা পরিহার করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা হিসেবে অবলম্বন করে আর এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা একে প্রতিমা পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এরই সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। যেভাবে প্রতিমার কাছে এক পূজারী মুক্তি যাচনা করে" (অর্থাৎ, প্রতিমা বানিয়ে সেই প্রতিমার কাছে ইবাদতের জন্য যায় এবং ধারণা করে, আমি যদি এর ইবাদত করি বা আমার পাপের জন্য এর কাছে ক্ষমা চাই, তবে আমি মুক্তি লাভ করব বা আমার লক্ষ্য অর্জিত হবে।) তিনি (আ.) বলেন, "মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে এক প্রতিমা বানায় এবং মনে করে, এই প্রতিমার মাধ্যমেই সে মুক্তি পাবে।" (আমি মিথ্যা বললে, আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।) তিনি বলেন, "অধঃপতন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! যদি বলা হয়, কেন প্রতিমা পূজা করছ? এই নোংরামী পরিহার কর। তারা বলে, কীভাবে এটি পরিহার করা যেতে পারে, এ ছাড়া যে কাজই চলে না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, তারা মনে করে তাদের সমস্ত সাফল্যের ভিত্তি মিথ্যার উপর। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অবশেষে সত্যই জয়যুক্ত হয়। কল্যাণ ও বিজয় তার-ই জন্য অবধারিত। স্মরণ রেখ! মিথ্যার মত অলক্ষুণে আর কিছুই নেই। বস্তুবাদী মানুষ সচরাচর বলে, সত্যবাদীকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু আমি এ কথা কীভাবে মানতে পারি? আমার বিরুদ্ধে তো ৭টি মামলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোন একটি মামলাতেও আমাকে একটি মিথ্যা শব্দও বলতে হয় নি। কেউ আমাকে বলুক, কোন একটিতেও কি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সত্যের সমর্থক এবং সাহায্যকারী। এটি কি হতে পারে যে, তিনি সততার এক পূজারীকে শাস্তি দিবেন! (এটি কীভাবে সম্ভব!) যদি এমন হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন মানুষ সত্য বলার সাহস দেখাবে না।" (সত্যবাদীরা যদি শাস্তি পাওয়া আরম্ভ করে, তাহলে পৃথিবীতে আর কেউই সত্য বলবে না।) তিনি (আ.) বলেন, " খোদার উপর থেকেই বিশ্বাস উঠে যাবে আর সত্য-পূজারীরা জীবন্মৃত হয়ে যাবে। আসল কথা হল, সত্য বলার ফলে যারা শাস্তি পায়, (সত্য বলার পরও যদি কেউ শাস্তি পায়, তবে) তারা তা সত্য বলার কারণে পায় না। বরং তাদের অন্য কোন প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত পাপের কারণে তারা শাস্তি পায় বা অন্য কোন মিথ্যার জন্য শাস্তি পায়। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের পাপ ও দুষ্কৃতির একটি তালিকা রয়েছে, তাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে আর সেগুলোর কোন একটির জন্য তারা শাস্তি পায়। **(আহমদী অওর গয়ের আহমদী ম্যা কিয়া ফারাক হ্যায়?, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৪৭৮-৪৮০)**

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনীতভাবে সিজদাবনত হয়ে নিজেদের পাপের জন্য সর্বদা আমাদের ক্ষমা যাচনা করা উচিত, যেন আমরা আমাদের গোপন কোন পাপের জন্য খোদার শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত না হই।

আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং আল্লাহ্ বর্ণিত মুত্তাকীদের একটি লক্ষণ হল, **وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)** অর্থাৎ, ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষকে মার্জনাকারী। **'عفو'** শব্দের অর্থ হল, নিজের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে কাউকে ক্ষমা করা। এটিকেই বলা হয় **'عفو'**। অতএব, মুত্তাকী কেবল রাগই সংবরণ করে না, বরং ক্ষমাও করে। আর ক্ষমাও এভাবে করে যে, যে-ই আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করুক না কেন আমি তা ভুলে যাই।

রাগ সংবরণের কী কী উপকারিতা রয়েছে, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখ! বিবেক-বুদ্ধি এবং রাগ ও উত্তেজনার মাঝে ভয়াবহ শত্রুতা রয়েছে। উত্তেজনা ও ক্রোধের সময় বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং সহনশীল হয়, তাকে এক জ্যোতি দেয়া হয়, যার ফলে তার বিবেক-বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তিতে এক নব জ্যোতির উন্মেষ ঘটে। আর এরপর নূর থেকে নূরের সৃষ্টি হয়। আর ক্রোধান্বিত ও উত্তেজনাকর অবস্থায় হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেহেতু তমশাচ্ছন্ন থাকে, তাই তমশা বা অন্ধকার থেকে অন্ধকারেরই জন্ম হয়। **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, "স্মরণ রেখ! যে ব্যক্তি কঠোর আচরণ করে এবং অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তার মুখ থেকে প্রজ্ঞা ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথা আদৌ নিঃসৃত হতে পারে না। সেই হৃদয়কে প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, যে তার প্রতিদ্বন্দ্বির সামনে খুব দ্রুত রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সীমার বাইরে চলে যায়। মুখ খারাপকারী এবং লাগামহীন ব্যক্তিকে সূক্ষ্মতার প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।" (যখন গালমন্দ বের হয়, মুখ থেকে নোংরা কথা বের হয়, বিশ্রী শব্দ বের হয় আর এতে কোন বাছ-বিচার থাকে না, তখন এমন মুখ ও ব্যক্তি ভালো কথা, খোদার পছন্দনীয় এবং পুণ্যের কথা হতে বঞ্চিত থাকে আর এমন মানুষ সব সময় নোংরা কথাই বলে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, "ক্রোধ ও প্রজ্ঞা সহাবস্থান করতে পারে না। ক্রোধের কাছে যে পরাস্ত হয়, তার মাথা মোটা এবং বিবেক-বুদ্ধি হয় ভোঁতা হয়ে থাকে।" (রাগান্বিত হলে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, তখন মানুষের চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে যায়।) তিনি (আ.) বলেন, "কোন ক্ষেত্রেই তাকে বিজয় এবং সাহায্য প্রদান করা হয় না। ক্রোধ হল, অর্ধ-উন্মাদনা আর এটি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন তা পুরো উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়। **[আল্ হাকাম, তারিখ ১০ মার্চ ১৯০৩, পৃ: ৮, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৯, উদ্ধৃত– তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ.১৫৩]**

অতঃপর আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, "পুরুষের উচিত, যথাযথ ও বৈধ স্থানে স্বীয় শক্তি নিচয়ের ব্যবহার করা। যেমন, ক্রোধশক্তি, এটি যখন মাত্রা অতিক্রম করে, তখন তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে। উন্মাদনা এবং এর মাঝে পার্থক্য খুবই সামান্য। (রাগ এবং উন্মাদনা বা পাগলামীর মাঝে পার্থক্য খুবই অল্প।) চরম রাগী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ কেড়ে নেয়া হয়। কাজেই, কোন বিরোধীর সাথেও অগ্নিশর্মা হয়ে কথা বলবে না।

(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৮, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

কেউ বিরোধী হলেও তার সাথে তোমার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কথা বলা উচিত নয়, বরং তখনো প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা উচিত। অতএব, খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করা আমাদের চরিত্রকে উন্নত করে তাঁর নৈকট্য প্রদানের পাশাপাশি আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকেও শাণিত করে তুলে। আর এর মাধ্যমে মানুষ নানান রকম শত্রুতা এবং ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। রগচটা এবং ঝগড়াটে অধিকাংশ মানুষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গিয়েছে, তারা কখনো লাভবান হয় নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "দুটো শক্তি মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে। (অর্থাৎ, উন্মত্ত বানিয়ে দেয়। সেগুলো কোন দু'টো শক্তি?) একটি হল, কুধারণা আর অপরটি হল ক্রোধ, যখন এগুলো সীমাতিক্রম করে। (অর্থাৎ, যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন মানুষকে তা উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে।) কাজেই, মানুষের জন্য কুধারণা ও রাগ পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। **(মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কুধারণা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ** **(সূরা আল্ হুজুরাত: ১৩)** অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কুধারণা পরিহারের বিষয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট থাক। কেননা, কিছু কিছু সন্দেহ পোষণ অবশ্যই পাপ হয়ে থাকে। আর (কারো বিরুদ্ধে) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গীবত বা কুৎসা করো না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটিকে চরমভাবে ঘৃণা করে থাক। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অনেক বেশি তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী।

এই আয়াতে প্রথম যে বিষয়টি পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা হল কুধারণা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুধারণা এমন একটি ব্যাধি ও ভয়ঙ্কর বিপদ, যা মানুষকে অন্ধ করে ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। **(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! সকল পাপ এবং মন্দ বিষয় কুধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়। তাই, আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" তিনি বলেন, "কুধারণা এড়িয়ে চলার জন্য মানুষের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন মন্দ ধারণা সৃষ্টি হলে (কোন বাজে ও কুধারণা সৃষ্টি হলে) ব্যাপক হারে ইস্তেগফার কর। (মনের মাঝে অন্য কারো সম্বন্ধে কুধারণার উদ্রেক হলে একে হৃদয়ে স্থান না দিয়ে, এ বিষয়ে চিন্তা না করে বা এ জন্য কারো ক্ষতি সাধনের পরিবর্তে অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত, যে অন্যের সম্পর্কে কুধারণার উদ্রেক হয়েছে) তিনি (আ.) বলেন, "অধিক হারে ইস্তেগফার কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর, যেন সেই পাপ এবং এর অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা পাও।" (যেন এই পাপ থেকে বাঁচা যায় এবং এই পাপের ফলে সৃষ্ট কুফল থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।) "যা এই কুধারণার ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে। একে সামান্য কোন বিষয় মনে করা উচিত নয়, এটি খুবই ভয়ঙ্কর একটি ব্যাধি।" **(মলফূযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

এরপর এই আয়াতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি করতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বারণ করেছেন তা হল, ছিদ্রান্বেষণ বা গোয়েন্দাগিরি করা। খুটে খুটে অন্যের দোষ বের করা বা কোন বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা। মানুষ যা বলতে চায় না, সে বিষয়ে গভীর আগ্রহের সাথে চেষ্টা করা, যেন আমি তা জানতে পারি। এটি অন্যায়, এ থেকেও মন্দ বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

আর তৃতীয় নির্দেশ হল, তোমরা পরচর্চা করবে না। পরচর্চা নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর আর তোমরা এটি চরমভাবে ঘৃণা করবে। মহানবী (সা.)-কে গীবত বা পরচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সা.) বলেন, কারো সম্পর্কে কোন সত্য কথা তার অবর্তমানে এমনভাবে বর্ণনা করা যে, উপস্থিত থাকলে সে তা অপছন্দ করবে, এটিই গীবত। কারো অবর্তমানে তার সম্পর্কে কথা বলা আর তা সত্য হলেও সে কথা যদি তার কাছে খারাপ লাগে তবে তা গীবত। আর তাতে যদি বর্ণিত সে বিষয়টি না-ই থাকে, তবে সেটি অপবাদ। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাব তাহরীমুল গীবাত, হাদীস নম্বর ৬৫৯৩)**

অতএব, মুত্তাকীর এমন কথা বলা শোভা পায় না, যা বললে সমস্যা সৃষ্টি হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই, পরচর্চাও করবে না আর অপবাদও আরোপ করবে না।

অতএব, রমযান মাসে যেখানে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চাই এবং আমাদের দোয়াগুলোকে কবুল বা গৃহীত হতে দেখতে চাই, সেখানে আমাদের এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকার এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলার সমূহ চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং রমযানের পরেও যেন আমাদের মাঝে এ সব পুণ্য বিদ্যমান থাকে। আর আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ইবাদতকারী ও পূর্ণ অনুগত বান্দা হতে পারি।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি একজন শহীদের জানাযা। জনাব চৌধুরী খলীক আহমদ সাহেব, পিতা চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব, তিনি করাচি জেলার গুলজার হিজরীর অধিবাসী। ২০১৬ সনের ৩০ জুন তারিখে ৪৯ বছর বয়সে জামা'তের বিরোধীরা তাকে রাত প্রায় ৯.৩০ মিনিটে তার ক্লিনিকে ঢুকে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সংবাদ অনুসারে চৌধুরী খলীক আহমদ সাহেব মেডিক্যাল ডিপ্লোমা করেছেন আর নিজের বাড়ির কাছেই এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক খুলেছিলেন। ঘটনার দিন তিনি রীতি অনুসারে ইফতারীর পর গুলজার হিজরীতে অবস্থিত ক্লিনিকে ফিরে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করা রোগীদের দেখছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে নয়টার দিকে হেলমেট পরিহিত দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ক্লিনিকে এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দু'টি গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হয় আর দু'টি লাগে বুকে। ক্লিনিকের পাশে অবস্থিত মেডিক্যাল স্টোরের মালিক

তাৎক্ষণিকভাবে মোটর সাইকেলে করে তার বাড়িতে গিয়ে সংবাদ দেয়। তার ছেলে গাড়ী নিয়ে আসে, গাড়ীতে করে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। করাচীর এই হালকা গুলজার হিজরীতেই গত মে মাসের ২৫ তারিখে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি গুলি করে হাজী গোলাম মহিউদ্দীন সাহেবের পুত্র জনাব দাউদ আহমদ সাহেবকেও শহীদ করে।

শহীদ মরহুমের বংশে আহমদীয়াত আসে তার দাদা অমৃতসর নিবাসী আল্লাহ্ বক্স সাহেবের মাধ্যমে। তার পরিবার অমৃতসর থেকে গোখোয়াল এবং রহিম ইয়ার খানে এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা সাংঘর জেলার শেহ্দাদপুরে স্থানান্তরিত হন। মরহুম ১৯৬৭ সনে সাংঘর জেলার শেহ্দাদপুরের নিকটবর্তী আহমদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর ১৯৮৮ সনে করাচী স্থানান্তরিত হন। এখানে মেডিক্যাল ডিপ্লোমা করেন এবং পরে একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরীতে রেডিও গ্রাফিক টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। একই সাথে তিনি সন্ধ্যার সময় নিজের ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করতেও আরম্ভ করেন। পরে ল্যাবরেটরির চাকুরি ছেড়ে সার্বক্ষণিকের জন্য মেডিক্যাল ক্লিনিকে বসতে আরম্ভ করেন। শহীদ মরহুম বহু গুণের আধার ছিলেন। তবলীগের জন্য গভীর প্রেরণা ছিল। ক্লিনিকেও তিনি অ-আহমদীদের তবলীগ করতে থাকতেন। শহীদ মরহুম বাজামা'ত নামায এবং নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি খুবই দরদি মানুষ ছিলেন। অভাবীদেরকে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতেন। কোন কোন অ-আহমদী রোগী বলত, আপনি কাদিয়ানী তাই আপনার কাছ থেকে ঔষধ নিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু কি আর করার, আপনার ঔষধেই যে সন্তানরা আরোগ্য লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন আর জামা'তী কাজেও তিনি অগ্রগামী থাকতেন। শহীদ মরহুম তার হালকায় মোহাস্সেল এবং আনসারুল্লাহ্র যয়ীম হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। একই সাথে তিনি গত ১৮ বছর ধরে উক্ত হালকার সেক্রেটারী ওয়াক্ফে নও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তার স্ত্রী বলেন এবং ছেলেমেয়েরাও লিখেছে, স্বল্প বয়সেই তিনি তাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করেছেন এবং তিনি নিজেও নিয়মিত পাঁচবেলার নামায যথাসময়ে পৃথক পৃথকভাবে পড়তেন। প্রতিদিন অনুবাদসহ কুরআন পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজেও নিয়মিত যুগ-খলীফার খুতবা শুনতেন এবং সন্তানদেরকেও সব সময় শোনাতেন, বরং অবশ্যই সকাল-সন্ধ্যা এমটিএ চালাতেন। যদি পরিবারের তরবীয়ত করতে হয়, তাহলে এমটিএ-ই তরবীয়তের সর্বোত্তম মাধ্যম।গ্রামের লোকদের প্রয়োজনে তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী বলেন, প্রায় একমাস পূর্বে স্বপ্নে আমি শরবতে পরিপূর্ণ দু'টি গ্লাস দেখি। আমি প্রশ্ন করি, কিসের শরবত, বিশেষ কোন শরবত মনে হচ্ছে? তখন স্বপ্নে আমাকে জানান হয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জিনিসের শরবত। শহীদ মরহুমের শাহাদতের পর বুঝতে পেরেছি, এটি শাহাদাতের অমৃত সুধা। ইতিপূর্বে জনাব দাউদ আহমদ সাহেব শহীদ হন আর তিনিও একই গলীতে বসবাস করতেন। কয়েক দিন পূর্বেই তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। দু'টি গ্লাস বলতে হয়ত এ দু'টি শাহাদাতকেই বুঝায়।

মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে ভাই-বোন ছাড়াও স্ত্রী বুশরা খলীক সাহেবা এবং দু'ছেলে আছেন। এদের একজন স্নেহের অনিক আহমদ, সে জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ায় অধ্যায়নরত এবং আরেক পুত্র রহিক আহমদ, সে পিটিএস-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এছাড়া এক কন্যা স্নেহের শামায়লা আহমদ, যার বয়স ১৬ বছর। এদেরকে তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন, আর পিতার পুণ্য যেন তার সন্তান-সন্ততির মাঝে সর্বদা বিরাজমান থাকে। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।